ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬: একটি সার্বিক মূল্যায়ন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৬ জুন, ২০১৬)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, বিগত ২২ মার্চ ২০১৬ থেকে শুরু করে ৪ জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ছয়টি ধাপে সম্পন্ন হলো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬। ব্যাপক সহিংসতা, অনিয়ম ও বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক ঘটনাবলীর কারণে অনেকেই এটিকে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ নির্বাচন বলে আখ্যয়িত করেছেন। নাগরিক সংগঠন সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা প্রথম থেকেই এই নির্বাচনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নজর রাখছিলাম। সেই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আমরা আমাদের মূল্যায়ন তুলে ধরছি।

১. দলভিত্তিক নির্বাচন: এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের বিশেষত্ব ছিল, এই প্রথমবার রাজনৈতিক দলভিত্তিকভাবে এবং দলীয় প্রতীকে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে অনেক আগে থেকেই দলভিত্তিক স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিরোধিতা করে আসলেও, এর সপক্ষে আইন প্রণীত হয় এবং উক্ত আইনের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

দলগতভাবে নির্বাচনের সপক্ষে যুক্তিগুলো ছিল, আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়ার কথা থাকলেও তা কমবেশি দলীয়ভাবেই হয়ে থাকে। তাই আইন করে দলভিত্তিকভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করলে রাজনৈতিক দলসমূহের দলভিত্তিক নির্বাচনের বিরাজমান প্রবণতা আইনি বৈধতা পাবে। আর একটি যুক্তি ছিল দলগতভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের কারণেই নির্বাচনমূখী দলগুলো অতীতের চেয়ে অনেক চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কেননা নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রত্যাশী দলীয় সদস্যরা আরও বেশি সক্রিয় হবেন এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন, নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী এমন অনেকেই রাজনৈতিক দলে যোগ দেবেন। বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন বিভিন্ন সময় হওয়ায় নির্বাচনগুলোকে সামনে রেখে দলগুলো সবসময়ই সরব থাকবে। দলভিত্তিক নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি আবশ্যিক হওয়ায় পদ্ধতিগতভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করতে গিয়ে দলে গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে। কারো কারো যুক্তি এমন ছিল যে, নির্বাচিত দলীয় জনপ্রতিনিধিরা দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নে লিপ্ত হলে একদিকে যেমন দলকে দায়বদ্ধ করা যাবে, পাশাপাশি তাঁদের কাজের সাফল্যের জন্য দলও বাহবা পাবে। ফলে রাজনৈতিক দল থেকে ভালো কাজের জন্য দলীয় জনপ্রতিনিধিদের ওপর চাপ থাকবে।

দলভিত্তিক স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিপক্ষের যুক্তিগুলো ছিল, **প্রথমত:** দলভিত্তিক নির্বাচন, বিরাজমান দুর্বৃত্তায়িত বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করবে। নির্বাচনের পূর্বেই রাজনৈতিক দলসমূহে অন্তর্দলীয় কোন্দল দেখা দেবে। মনোনয়ন বাণিজ্যের বিস্তৃতি তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। **দ্বিতীয়ত:** দলগতভাবে জয়লাভের মরিয়া প্রচেষ্টায় নির্বাচনী সহিংসতা বৃদ্ধি পাবে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের যে কোনো মূল্যে জয়ের আকাঙ্ক্ষাও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করবে। **তৃতীয়ত:** দলীয়করণের প্রভাবের কারণে দায়িত্ব পালনে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব দেখা দেবে। **চতুর্থত:** দায়িত্ব পালনে নৈতিক সাহসের অভাব ও নির্বাচনী অনিয়ম কঠোরভাবে দমন করতে না পারার ব্যর্থতায় কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ উঠতে পারে। **পঞ্চমত:** রাজনীতির সাথে যুক্ত না হয়েও যেসকল সমাজকর্মী অতীতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে জনসেবায় অবদান রাখতেন, দলভিত্তিক নির্বাচনের ফলে এই মানুষগুলো হারিয়ে যাবেন: সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে তাঁদের অবদানও।

উল্লেখ্য, এক সময় এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে, জনসেবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে রাজনীতি। যারা ত্যাগের সংস্কৃতি লালন করেন এবং জনকল্যাণকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন, তাঁরাই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। বর্তমানে আমাদের দেশের রাজনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। এখন ত্যাগের সংস্কৃতির পরিবর্তে রাজনীতিতে চালু হয়েছে ভোগের সংস্কৃতি। সৎ নেতা-কর্মীদের কোনঠাসা করে অসৎ নেতা-কর্মীদের দাপট এখন বড় বড় প্রতিটি দলেই দৃশ্যমান। আর এদের কর্মকাণ্ডই 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে।

এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সংঘটিত ঘটনাবলীই প্রমান করে যে, আমাদের আশঙ্কাগুলো যৌক্তিক ছিল। পাশাপাশি দলভিত্তিক নির্বাচনের যে নগ্ন চেহারা উন্মোচিত হয়েছে, তা এর সপক্ষে প্রদত্ত ইতিবাচক যুক্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই আমরা মনে করি, ব্যাপক সহিংসতা ও অনিয়মের মধ্য দিয়ে এবারে যে মন্দ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হলো, এর প্রধান কারণ দলভিত্তিক নির্বাচন। উল্লেখ্য, অতীতে রাজনৈতিক দলগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে দলীয় অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করলেও একই দল থেকে একাধিক প্রার্থী অংশ নেওয়ায় নির্বাচনগুলো বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন কখনই পুরোপুরি রাজনৈতিক পরিচিতি পায়নি।

২. মনোনয়ন বাণিজ্য: অতীতে নির্দলীয় নির্বাচন হওয়ায় প্রার্থী মনোনয়নের প্রয়োজন হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো থেকে তখন কোথাও কোথাও কোনো কোনো প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হতো। একই দলের একাধিক প্রার্থী থাকলে তাও করা হতো না। দলভিত্তিক স্থানীয় সরকার নির্বাচন ব্যবস্থার কারণে এবারে নির্বাচনী আইনানুযায়ী দলগুলোকে প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রদান করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে দলগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদানের বিষটির ওপর গুরুত্বারোপ করেনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখানে গুরুত্ব পেয়েছে অর্থ ও পেশিশক্তি। প্রার্থীদের দিক থেকে গুরুত্ব পেয়েছে মনোনয়ন প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্টদের সন্তুষ্টি বিধানের বিষয়টি। ফলে দেদার বাণিজ্য হয়েছে এই নির্বাচনকে ঘিরে।

বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধেই মূলত মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। ক্ষমতাসীন দলের ক্ষেত্রে এই অভিযোগ ব্যাপক। এক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের বিরুদ্ধে বেশি করে উঠেছে এ অভিযোগ। দেখা গিয়েছে যে, কয়েক ধাপে হয়েছে মনোনয়ন বাণিজ্য। সর্বপ্রথম কাজটি ছিল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের মন যুগিয়ে নিজের সপক্ষে আওয়াজ তোলা। দ্বিতীয় কাজটি

ছিল সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলা নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করা। মাননীয় সংসদ সদস্যের সন্তুষ্টিবিধান মনোনয়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ ধাপ ছিল কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড। অনেক ক্ষেত্রে এধাপটিতেও কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে অনেককে। বিশেষ করে এই পর্যায়ে এসে যারা পূর্বের নাম পরিবর্তন করে নিজের নামটি চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন। মনোনয়ন বাণিজ্যের পাশাপাশি নির্বাচনে জয়ের পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং ফলাফল পাল্টে দেয়ার জন্যও বিনিয়োগের অভিযোগ আছে কোথাও কোথাও।

মনোনয়ন বাণিজ্যের বিষয়টি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করেছেন ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। নিজ দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে দলছুট ব্যক্তিদের এমনটি বিএনপি-জামাতপন্থীদের মনোনয়ন দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে।

রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ যদি মনোনয়ন বানিজ্যের কথা না ভেবে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রদান করতেন তবে তা একদিকে যেমন দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের পথ সুগম করতো অপরদিকে তা দলে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে ভালো মানুষের নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতো। জনসেবার ক্ষেত্রে এর সুফল হতো সুদুর প্রসারী।

৩. নির্বাচনে সহিংসতা: বাংলাদেশে এ পর্যন্ত নয়বার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। আমাদের দেশে নির্বাচন বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গ্রামে-গঞ্জে একদিকে যেমন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি প্রার্থী ও সমর্থকদের বিরোধে সংঘাত-সংঘর্ষও হয়। ফলে হতাহতের ঘটনাও ঘটে থাকে। এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে।

৩.১. সহিংসতায় প্রাণহানি: ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রাণহানির তথ্য অনুসন্ধানে করে দেখা যায় যে, ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৩ ও ১৯৯২-এ প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি। ১৯৮৮ সালে ৮০ জন, ১৯৯৭ সালে ৩১ জন, ২০০৩ সালে ২৩ জন এবং ২০১১ সালে ১০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে বলে জানা যায়। ইতোপূর্বে অধিক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে ১৯৮৮ সালে। ঐ নির্বাচনটিকেই সবচেয়ে মন্দ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করা হতো।

প্রাণহানির ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হলো এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত তালিকা অনুযায়ী, এবার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সংঘর্ষ এবং নির্বাচনকেন্দ্রিক বিরোধের জেরে ১৪৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রথম ধাপের নির্বাচনের পূর্বে ১০ জন, প্রথম ধাপের নির্বাচনের দিন ১১ জন, প্রথম ধাপের নির্বাচনের পর থেকে দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ১১ জন, দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন ৯ জন, দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের পর থেকে তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ১৭ জন, তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন ৫ জন, তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের পর চতুর্থ ধাপের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ১০ জন, চতুর্থ ধাপের নির্বাচনের দিন ৮ জন এবং চতুর্থ ধাপের নির্বাচনের পর থেকে এ পর্যন্ত ২৩ জন, পঞ্চম ধাপের নির্বাচনের দিন ১৫ জন, পঞ্চম ধাপের নির্বাচনের পর ৮ জন, ষষ্ঠ ধাপের নির্বাচনের দিন ৫ জন এবং ষষ্ঠ ধাপের নির্বাচনের পর ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছে।

বিভাগভিত্তিক প্রাণহানির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩২ জন, ঢাকা বিভাগে ২৯ জন, রাজশাহী বিভাগে ২০, বরিশাল বিভাগে ১৭ জন, জন, খুলনা বিভাগে ১৭ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৬ জন, রংপুর বিভাগে ৯ জন এবং সিলেট বিভাগে ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন। জেলাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৬৪টি জেলার সবগুলোতেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেই প্রাণহানি ঘটেছে ৪৬টিতে। সর্বোচ্চ ১১জন প্রাণ হারিয়েছে চট্টগ্রাম জেলায়। ৭জন করে প্রাণ হারিয়েছে পিরোজপুর, যশোর ও ময়মনসিংহ জেলায়; ৬জন প্রাণ হারিয়েছে কুমিল্লা জেলায়; ৫জন করে প্রাণ হারিয়েছে কক্সবাজার, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, ও জামালপুর জেলায়; ৪জন করে প্রাণ হারিয়েছে ঢাকা, গাজীপুর, মাদারীপুর, নরসিংদী, নড়াইল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী ও গাইবান্ধা জেলায়; ৩জন করে প্রাণ হারিয়েছে কিশোরগঞ্জ, ঝিনাইদহ, ভোলা, ঠাকুরগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও নাটোর জেলায়; ২জন করে প্রাণ হারিয়েছে মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, মাগুরা, বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুষ্টিয়া, নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলায় এবং ১জন করে প্রাণ হারিয়েছে মানিকগঞ্জ, ফেনী, চাঁদপুর, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, সিলেট, সুনামগঞ্জ, বাগেরহাট ও জয়পুরহাট জেলায়।

নিহতদের দলগত পরিচয়ের দিক থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী বা সমর্থক ৫২ জন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী বা সমর্থক ১৭ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ৩ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিদ্রোহী ১ জন, জাতীয় পার্টি-জেপি'র ১ জন, জনসংহতি সমিতির ১ জন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী বা সমর্থক ৪ জন, মেম্বার প্রার্থীর কর্মী বা সমর্থক ৩২ জন, পুলিশ কনস্টেবল ১ জন এবং গ্রামপুলিশ ১ জন রয়েছেন। ৩২ জনের ক্ষেত্রে কোনো দল বা প্রার্থীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া যায়নি। নিহতদের মধ্যে একজন নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান, একজন চেয়ারম্যান প্রার্থী, একজন সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী এবং ৪ জন মেম্বার প্রার্থীসহ ৬ জন নারী ও ৬ জন শিশুসহ রয়েছে। নিহত সর্বমোট ১৪৫ জনের মধ্যে চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা বিরোধেই প্রাণ গিয়েছে ৮৯জনের। চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর কর্মী বা সমর্থকদের মধ্যে। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে প্রাণঘাতি সংঘর্ষের ঘটনা জানা গিয়েছে মাত্র ৩টি। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, অধিকাংশ ইউনিয়নে বিএনপি'র সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। পাশাপাশি যেসকল স্থানে বিএনপি ছিল, সেখানে তারা সংঘর্ষের ন্যূনতম সম্ভাবনা বা ঝুঁকি এড়িয়ে চলেছে।

এ পর্যন্ত নিহত ১৪৫ জনের মধ্যে নির্বাচন-পূর্ব সংঘর্ষে ৫৬ জন, নির্বাচনকালীন সংঘর্ষে ৫৭ জন এবং নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষে ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আমরা মনে করি যে, প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ না করে, যে কোনো মূল্যেই জয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই নির্বাচনী সহিংসতার বড় কারণ।

৩.২. সহিংসতায় আহত: নির্বাচনী সহিংসতায় প্রাণহানির পাশাপাশি ব্যাপক সংখ্যক মানুষ আহতও হয়েছেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে এগারো হাজারেরও অধিক মানুষ আহত হয়েছে। তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তফসিল

ঘোষণার পর থেকে প্রথম ধাপের নির্বাচনের দিন পর্যন্ত দুই হাজার ছয়শত জনের অধিক (২,৬৬০), প্রথম ধাপের পর থেকে দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন পর্যন্ত এক হাজার ছয়শত জনের অধিক (১,৬০৮), দ্বিতীয় ধাপের পর থেকে তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের দিন পর্যন্ত দুই হাজার আটশত জনের অধিক (২,৮৮২), তৃতীয় ধাপের পর থেকে চতুর্থ ধাপের নির্বাচনের দিন পর্যন্ত এক হাজার দুইশত জনের অধিক (১,২৮৫), চতুর্থ ধাপের পর থেকে পঞ্চম ধাপের নির্বাচনের দিন পর্যন্ত এক হাজার আটশত জনের অধিক (১,৮৩৬), পঞ্চম ধাপের পর থেকে ষষ্ঠ ধাপের নির্বাচনের দিন পর্যন্ত এক হাজার জনের অধিক (১,০১৬) এবং ষষ্ঠ ধাপের পর থেকে অদ্যাবধি তিন শতাধিক (৩১৫) ব্যক্তি আহত হয়েছেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি জেলারই কোথাও না কোথাও নির্বাচনী সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে (তথ্যসূত্র: যুগান্তর)।

৪. বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া: অতীতে কোনো নির্বাচনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টিকে আমরা দেখেছি ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে। নির্বাচনী আইনানুযায়ী এটা দোষের না। চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার অতীতের যে তথ্য পাওয়া যায়, সে হিসেবে চেয়ারম্যান পদে ১৯৮৮ সালে ১০০ জন, ১৯৯২ সালে ৪ জন, ১৯৯৭ সালে ৩৭ জন এবং ২০০৩ সালে ৩৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১১ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রেও ১৯৮৮ সালে ১০০ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সংখ্যাটি ছিল সর্বোচ্চ।

তবে অতীতের সকল রেকর্ড ম্লান হয়ে গিয়েছে এবারের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের সংখ্যার কাছে। নবম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এই সংখ্যা ২১৪। প্রথম ধাপে ৫৪ জন, দ্বিতীয় ধাপে ৩৪ জন, তৃতীয় ধাপে ২৯ জন, চতুর্থ ধাপে ৩৫ জন, পঞ্চম ধাপে ৩৯ জন এবং ষষ্ঠ ধাপে ২৪ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এদের মধ্যে মাত্র ২ জন স্বতন্ত্র এবং অবশিষ্ট ১১২ জনই ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত।

ব্যাপকহারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার করাণ অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, অনেক স্থানে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, মনোনয়নপত্র জমাদানে বাধা প্রদান, মনোনয়নপত্র কেড়ে নেওয়া বা ছিঁড়ে ফেলার কারণে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। কেউ কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও চাপ সৃষ্টির কারণে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন। ছোট-খাটো বা সংশোধনযোগ্য ত্রুটির কারণে যাচাই-বাছাই কালে বাতিল হয়ে গেছে অনেকের মনোনয়নপত্র।

অনুসন্ধানে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার আর একটি বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, অনেক ইউনিয়নে বিএনপি কর্তৃক প্রার্থী না দিতে পারাকে। অনেক অঞ্চলে মামলা ও গ্রেপ্তারে ভয়ে সম্ভাব্য প্রার্থীরা পালিয়ে গিয়েছেন। কোনো কোনো এলাকায় নিজের ও পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় অনেকে দলের কাছে মনোনয়নই চাননি। কোথাও কোথাও বিএনপি নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। ফলে দেখা গিয়েছে যে, এই নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীশূন্য ছিল মোট ৫৫৪টি ইউনিয়ন। প্রথম ধাপে ১১৯, দ্বিতীয় ধাপে ৭৯, তৃতীয় ধাপে ৮১, চতুর্থ ধাপে ১০৬টি, পঞ্চম ধাপে ১০০টি এবং ষষ্ঠ ধাপে এখন পর্যন্ত ৬৯টি ইউনিয়নে বিএনপি'র প্রার্থীশূন্য ছিল। বিএনপির মত একটি বড় রাজনৈতিক ৫৫৪টি ইউনিয়নে প্রার্থী না থাকা একটি বড় ঘটনা বটে!

আমরা মনে করি, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার হার যেভাবে বাড়ছে তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। সম্পদশালী ও পেশীশক্তির অধিকারী প্রভাবশালী প্রার্থী বা দলের কাছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য এটা একটি জনপ্রিয় কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এতে করে নির্বাচনী ব্যবস্থা আরও অকার্যকর হয়ে পড়তে পারে – যা জাতির জন্য হবে আত্মঘাতি।

৫. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা: দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষ করে বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় নির্বাচনপূর্ব ও নির্বাচন পরবর্তীকালে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় হামলার শিকার হয়েছে। বাগেরহাটের চিতলমারী ও ফকিরহাট এবং বরিশালের বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া ও উজিরপুরের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার পাশাপাশি বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। এক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি ঘটনা ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অথবা আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থকদের মাধ্যমে ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কোনো কোনো এলাকায় নির্বাচনের পূর্বে সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগও পাওয়া গিয়েছে।

সুজন ছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলাসহ নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য, সাবেক মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকেও এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা গিয়েছে।

৬. নির্বাচন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা: নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকলেও নির্বাচন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই যদি স্ব স্ব অবস্থানে থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না করে, তবে কখনই অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্টদের বিশেষ করে নির্বাচন কমিশন, সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহকে তাদের ভূমিকা যথাযথ ভাবে পালন করতে দেখা যায়নি।

৬.১. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা: একটি নির্বাচনের সঙ্গে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকলেও নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনের আইনী, নৈতিকতাপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সাহসী ভূমিকাই পারে নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে। এবারের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনকে কখনই সক্ষমতা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়নি। বরং প্রথম থেকেই

নির্বাচন কমিশনকে দুর্বল অবস্থানে দেখা গিয়েছে। প্রথম ধাপের মনোনয়ন পত্র দাখিলের সাথে সাথেই যখন গণমাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক ইউনিয়নে একটি করে মনোনয়ন পত্র জমা পড়া, মনোনয়ন পত্র জমাদানে বাধা দেওয়া, কেড়ে নেওয়া, ছিঁড়ে ফেলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হামলা করা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে এবং কোনো কোনো অঞ্চলের নির্বাচন স্থগিত করার দাবি উঠেছে; তখন কমিশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, অভিযোগ না পেলে তারা কোনো অনিয়মের বিষয়কে আমলে নেবে না। অভিযোগ করা হলে বলা হয়েছে, অভিযোগ সুনির্দিষ্ট নয়। এমনকি সুস্পষ্টভাবে অভিযোগ করলেও তারা ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পদক্ষেপ গ্রহণের দায় চাপিয়েছে কখনও রিটার্নিং অফিসার বা কখনও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের উপর। আমরা জানি যে, বাংলাদেশের বিরাজমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে স্থানীয় প্রভাবশালী কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এক রকম দুঃসাধ্যই বলা যায়। কমিশনের জন্য যা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ।

প্রথম ধাপের নির্বাচনের আগের দিন গণমাধ্যমের কাছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ বলেছেন "আমরা নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রের অন্য বিভাগের ওপর নির্ভরশীল। যে কারণে তাদের উপর আমাদের কর্তৃত্ব কম। কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পাই না। সেজন্য মারপিট হানাহানি অব্যাহত আছে। নির্বাচন অর্থকেন্দ্রিক হয়ে গেছে।" যে সময় নির্বাচন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্টদের নির্বাচন কমিশন থেকে একটি কঠোর বার্তা যাওয়া উচিত ছিল, সেই সময় একটি ভুল বার্তা দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে। তার এই বক্তব্য ভোটারদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির পরিবর্তে শঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা মনে করি, নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতার কারণেই ভোটকেন্দ্রে প্রতিপক্ষের এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়া বা ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া; বুথ দখল করে বা ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সিল মারা; চেয়ারম্যান প্রার্থীকে প্রকাশ্য ভোট দিতে বাধ্য করা বা চেয়ারম্যানের ব্যালট পেপার কেড়ে নেওয়া; নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্তৃক ভোটারদের হাতে শুধুমাত্র সদস্য পদপ্রার্থীদের ব্যালট পেপার দেওয়া; নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যালট পেপারে সিল মারা বা সিল মারতে সহায়তা করা; নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনকালে ও নির্বাচনের পর ব্যাপক সহিংসতা; ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা ইত্যাদি ঘটনা প্রতিটি ধাপেই ঘটেছে। কোনো কোনো এলাকায় ভোট প্রদানে এমন অস্বাভাবিকতা ছিল যে, ভোট প্রদানের তালিকায় মৃত ব্যক্তি ও প্রবাসীরাও ছিলেন। কোথাও কোথাও ভোট পড়ার হার ছিল ১০০%-এরও অধিক। কোনো কোনো ইউনিয়নে নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। গত ১৩ জুন ২০১৬, *দৈনিক ইত্তেফাকে* "ইউপিতে ফল ঘোষণায় ব্যাপক অনিয়ম" শিরোণামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে যশোর জেলার কেশবপুরের বিদ্যানন্দকাটি, নীলফামারী জেলার জলঢাকার ধর্মপাল এবং চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালীর আহল্লা কড়লডেঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। একই প্রতিবেদনে মেম্বার পদের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে। কক্সবাজার জেলার উখিয়ার হলদিয়াপালং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদের ফলাফল পাল্টে দিয়ে বিজয়ী করা হয়েছে সরকারের উচ্চ পদস্থ এক কর্মকর্তার ভাইকে। উল্লেখ্য, ফলাফল পাল্টে দেওয়ার তথ্য পূর্বেও তুলে ধরা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা ভঙ্গেরও অভিযোগ উঠেছে। তৃতীয় ধাপের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর যখন দেখা যায় যে, সন্ত্রাসীদের ভয়ে ১৯টি ইউনিয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এবং ২৭টি ইউনিয়নে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেননি, তখন রাঙ্গামাটি জেলার সকল ইউনিয়নের নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। অনেকেই বলছেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেননি বলেই নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেননা প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যক ইউনিয়নে (প্রথম ধাপে ১১৯ ও দ্বিতীয় ধাপে ৭৯টি) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে না পারলেও এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নসমূহের নির্বাচন স্থগিতের দাবি উঠলেও নির্বাচন কমিশন তখন নির্বাচন স্থগিত করেনি। তখন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল 'কে দাঁড়ালো না দাঁড়ালো তা দেখার দয়িত্ব কমিশনের নয়'। উল্লেখ্য, প্রথম ধাপের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৫৪ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর মধ্যে ৩৪ জনই ছিলেন বাগেরহাট জেলার।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যথাযথ ভূমিকা পালন করুক। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীসহ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে কঠোর ভূমিকা পালন করুক। সকল দল ও প্রার্থীর জন্য 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করুক। কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করুক। কেউ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ভোটদানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই রোধে পূর্ব থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের আচরণে সে আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি।

৬.২. সরকারের ভূমিকা: একটি নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ করার ক্ষেত্রে সরকারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া নির্বাচন কমিশনের একার পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এই নির্বাচনে আমরা প্রায়শই সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নির্বাচনী নিয়ম-কানুন মেনে না চলার প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। প্রথম থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিকে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করতে দেখা গিয়েছে। কোথাও কোথাও কেন্দ্র দখল ও জাল ভোট প্রদানে তাদের সহযোগিতা করতে, এমন কি নিজেদেরকে জাল ভোট দিতেও দেখা গিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধেও নিষ্ক্রিয়তা ও জাল ভোট প্রদানে সহযোগিতার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব অনিয়ম ঘটেছে প্রকাশ্যভাবে। প্রথম দিকে সরকারের কোনো কোনো মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, কৃতকর্মের জন্য পুলিশ বিভাগের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হলেও, কোথাও কোথাও সরকারের অসহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, নির্বাচনের শুরু থেকেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের অপতৎপরতা রোধে সরকারের দিক থেকে কোনো কার্যকর উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানে সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে যেন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয় এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হয়। সরকারের মন্ত্রীগণসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা যেন নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, নির্বাচনী প্রচারণা থেকে বিরত থাকেন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত না করেন, সে ব্যাপারে তাদেরকে যেন সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি যেন এই মর্মে হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয় যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে এবং নির্বাচনী দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু সরকারের দিক থেকে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

৬.৩. রাজনৈতিক দলের ভূমিকা: রাজনৈতিক দলসমূহও বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দল এই নির্বাচনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেনি। তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গসহ বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনী অনিয়ম ছাড়াও মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে ব্যাপকভাবে। দলের প্রার্থী, কর্মী, সমর্থক এমনকি সংসদ সদস্যগণ আচরণবিধি ভঙ্গসহ বেপরোয়া আচরণ করলেও, তা প্রতিরোধে দলের হাইকমাণ্ডকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটারদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, রাজনৈতিক দলগুলো যেন নির্বাচনী আচরণবিধিসহ নির্বাচনী আইন-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলে। তারা যেন মনোনয়ন বাণিজ্যের মনোভাব পরিহার করে, সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেন। দলীয় সংসদ সদস্যগণ নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে যেন কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। 'যে কোনো মূল্যেই জয়ী হওয়া'র দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে তারা যেন নির্বাচনকে প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ করে। কিন্তু ভোটারদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি।

৭. নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া: প্রতিটি ধাপের নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে "বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া সার্বিকভাবে এ নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ভোটারদের উপস্থিতি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, অল্প কিছু জায়গায় অনিয়ম হয়েছে।" এই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। কখনও কখনও সহিংসতার বিষয়টি কমিশন স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছে। **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের** পক্ষ থেকেও নির্বাচন কমিশনের অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এক পর্যায়ে এসে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য কঠোরভাবে আইন আইন প্রয়োগের জন্য দলটির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আহ্বান জানানো হয়, সহিংসতা বন্ধ করার জন্যও। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের** পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধাপে নির্বাচনে সন্ত্রাস, কেন্দ্র দখল, ভোট জালিয়াতি, দলীয় এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া, প্রার্থীদের উপর হামলা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির চিত্র তুলে ধরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। কখনও কখনও 'ভোট ডাকাতি'র নির্বাচন আখ্যা দিয়ে তা বাতিল ও নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ দাবিও করা হয়। এক পর্যায়ে অনিয়মের অভিযোগে পরবর্তী ধাপগুলোর নির্বাচনে বিএনপি বা তার নেতৃত্বাধীন জোটের পক্ষ থেকে অংশ না নেওয়ার মনোভাব ব্যক্ত করা হলেও পরবর্তীতে সবগুলো ধাপের নির্বাচনে অংশ নিয়েছে দলটি। **জাতীয় পার্টির** পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় কেন্দ্র দখল, দলীয় এজেন্টদের বের করে দিয়ে জাল ভোট দেওয়া, প্রার্থীদের উপর হামলা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ করা হয়েছে। এসবের জন্য তারা নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেন। **বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির** পক্ষ থেকেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইউনিয়নে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর পক্ষে কেন্দ্র দখল, প্রতিদ্বন্দ্বী এজেন্টদের বের করে সিল মারার উৎসব করার অভিযোগ আনা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্র দখলদার ও সন্ত্রাসীদের পক্ষে ভূমিকা পালনেরও অভিযোগ আনা হয়েছে। **পর্যবেক্ষক সংস্থা ব্রতী' ও মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)সহ** বিশিষ্ট নাগরিদেরকেও বিভিন্ন অনিয়ম ও সহিংসতার বিষয়গুলো তুলে ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করতে এবং সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করতে দেখা গিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিক্রিয়ার দিকটি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, নির্বাচন কমিশন ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়ার ধরন কিছুটা এক রকম – যা ইতিবাচক। অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়ার ধরনটা ছিল প্রায় বিপরীতমূখী – যা সমালোচনা ও পরামর্শমূলক।

৮. নির্বাচনের ফলাফল: ব্যাপক সহিংসতা ও অনিয়মসহ বিভিন্ন কারণে এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হয়নি। তাই, ফলাফল হয়েছে একপেশে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত নির্বাচন কমিশন সূত্রের তথ্য অনুযায়ী মোট ৬ ধাপে নির্বাচন হয়েছে ৪১০৪ টি। ফলাফল ঘোষিত হয়েছে ৪০০০টি ইউনিয়নের। স্থগিত আছে ১০৪টি ইউনিয়নের ফলাফল। ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৬৬৭টি (৬৬.৬৭%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৩৬৭টি (৯.১৭%), জাতীয় পার্টি-জাপা ৫৭টি (১.৪২%), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ ৮টি (০.২০%), জাতীয় পার্টি-জেপি ৫টি (০.১২%), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ৩টি (০.১২%), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৩টি (০.০৭%), জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ ১টি (০.০২%), জাকের পার্টি ১টি (০.০২%) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৮৮৮টি (২২.২%) ইউনিয়নে জয়ী হয়েছে। আমাদের হাতে আসা ফলাফল নিম্নের ছকেও প্রদত্ত হলো (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ১৪ এপ্রিল ২০১৬)।

রাজনৈতিক দল	নির্বাচন হওয়া ইউপি'র সংখ্যা	ফলাফল ঘোষণা	স্থগিত	বিজয়ী (ইউনিয়ন)		মন্তব্য
				সংখ্যা	শতকরা	
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪১০৪	৪০০০	১০৪	২৬৭৭	৬৬.৬৭	২১৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি				৩৬৭	৯.১৭	
জাতীয় পার্টি-জাপা				৫৭	১.৪২	
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ				৮	০.২০	
জাতীয় পার্টি-জেপি				৫	০.১২	

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি				৩	০.০৭	
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ				৩	০.০৭	
জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ				১	০.০২	
জাকের পার্টি				১	০.০২	
স্বতন্ত্র				৮৮৮	২২.২	
সর্বমোট	**৪১০৪**	**৪০০০**	**১০৪**	**৪০০০**	**১০০**	

ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, চেয়ারম্যান পদে শতকরা ৬৬.৬৭% ইউনিয়নেই জয় পেয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার কথা থাকলেও দলটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধারে কাছেও ছিল না। বরং আওয়ামী লীগের সঙ্গে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের। আর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী চেয়ারম্যানদের সিংহভাগই ছিলেন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী। সেই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শতকরা ৮৫-৮৬% ইউনিয়ন কোনো না কোনো ভাবে গিয়েছে আওয়ামী লীগের দখলে।

ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় পেলেও এই নির্বাচনে দলটির কিছু দুর্বলতাও প্রকাশ পেয়েছে। **প্রথমত,** প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলটি যথাযথভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** দলীয় নেতৃত্বের কাছে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সততা ও যোগ্যতা, অর্থ ও পেশিশক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে। প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত নেতৃত্বের সততাও। **তৃতীয়ত,** সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ায়, 'এই দলের নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে কখনও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়' এই প্রচারণাটি পূর্বের চেয়ে অধিক বিশ্বাসযোগ্যতা পেতে পারে। **চতুর্থত,** দলগত নির্বাচনের সপক্ষে দলটির পক্ষ থেকে যেসকল যুক্তি দেখানো হয়েছিল, সংশ্লিষ্টদের বিতর্কিত আচরণের কারণে সেগুলোর প্রায়োগিকতা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। **পঞ্চমত,** গণতান্ত্রিক চেতনায় আস্থাশীল না হয়ে দলীয় প্রার্থী বা দলের বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে যেন-তেন প্রকারে নির্বাচনে জয়ী হওয়া ও বিজয়ী করার মরিয়া মনোভাব জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। **ষষ্ঠত,** নির্বাচনকালে মহাজোট তথা ১৪ দলীয় জোটের শরিক দলগুলোর সাথেও দলটির বেপরোয়া ও হিংসাত্মক আচরণ পারস্পরিক আস্থাহীনতার কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলেরও অনেক দুর্বলতা বেরিয়ে এসেছে। **প্রথমত,** দলটি যে অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল তা এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে; বেশির এলাকায় নির্বাচনের মাঠে দলটির নেতা-কর্মীদের সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি। **দ্বিতীয়ত,** ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে ভবিষ্যতে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এই দলের নেতা-কর্মীদের পক্ষে সম্ভব কি না, প্রশ্নটি সামনে এসেছে। নির্বাচনের আগে থেকেই গ্রেপ্তার আতঙ্কে অনেক এলাকার নেতা-কর্মীরা ছিলেন এলাকাছাড়া। **তৃতীয়ত,** দলটির সাম্প্রতিক অতীতের আন্দোলন কৌশলের দুর্বলতার কারণে নেতা-কর্মীরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ বঞ্চিত হয়েছে কি না এ প্রশ্ন জনমনে দেখা দিয়েছে। **চতুর্থত,** স্বাধীনতা বিরোধী তথা যুদ্ধাপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট দল ও ব্যক্তির সাথে সখ্যতার কারণে ভোটাররা বিশেষ করে তরুণ ভোটাররা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কি না, সচেতন মানুষদের মধ্যে এ প্রশ্নও উঠেছে। তবে, এত দুর্বলতা প্রকাশিত সত্ত্বেও বিএনপি'র কিছু লাভও হয়েছে। কেননা, এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের অগণতান্ত্রিক আচরণ, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া, কোথাও কোথাও নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পক্ষপাতদুষ্টতা ইত্যাদি ভবিষ্যতে দলটির রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ে সুযোগ বা পূঁজি হিসেবে কাজে আসতে পারে।

উল্লেখ্য, ফলাফলের ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিবেচ্য যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও প্রার্থীরা প্রতিযোগিতার জন্য 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' পায়নি।

৯. চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী নারী: প্রাপ্ত ফলাফলে চেয়ারম্যান পদে ২৯ জন নারীর নির্বাচিত হওয়ার তথ্য পাওয়া গিয়েছে। প্রথম ধাপে ৮জন, দ্বিতীয় ধাপে ৪জন, তৃতীয় ধাপে ২জন, চতুর্থ ধাপে ৩জন, পঞ্চম ধাপে ৭জন ও ষষ্ঠ ধাপে ৫জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত ২৯জনের মধ্যে ২৪জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং ১জন জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। এছাড়া ৪জন ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ২৪ জনের মধ্যে ৬ জনই বিনা প্রতিদ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। বিজয়ী নারী চেয়াম্যানদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক্রমিক	নাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা	বিভাগ	রাজনৈতিক দল	মন্তব্য
প্রথম ধাপ:							
১	মর্জিনা বেগম	সোনাইলতলা	মংলা	বাগেরহাট	খুলনা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত
২	বিউটি আক্তার	সন্তোষপুর	চিতলমারী				
৩	শিরীনা আখতার	ফকিরহাট	ফকিরহাট				
৪	মোরশেদা আক্তার	তেলিগাতী	মোড়েলগঞ্জ				
৫	তাছলিমা বেগম	রাঢ়ীপাড়া	কচুয়া				
৬	জেসমিন আক্তার	সিদ্ধকাঠি	নলছিটি সদর	ঝালকাঠি	বরিশাল		বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত
৭	প্রগতি মণ্ডল	দৈহারী	নেছারাবাদ	পিরোজপুর			
৮	সানজিদা আক্তার	মালখানগর	সিরাজদিখান	মুন্সিগঞ্জ	ঢাকা		

দ্বিতীয় ধাপঃ							
১	নাছরিন সুলতানা	নওয়াপাড়া	যশোর সদর	যশোর	খুলনা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
২	নাজনীন নাহার	রামনগর					
৩	রওশন আরা বেগম	বাহিরচর	ভেড়ামারা	কুষ্টিয়া			
৪	মৌসুমী আক্তার	নবীনগর (পূর্ব)	নবীনগর	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	চট্টগ্রাম	স্বতন্ত্র	
তৃতীয় ধাপঃ							
১	মোছাঃ ছনিয়া সবুর	রাজাপুর	বেলকুচি	সিরাজগঞ্জ	রাজশাহী	আওয়ামী লীগ	
২	নার্গিস আক্তার বুবলি	কুলাউড়া	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার		স্বতন্ত্র	
চতুর্থ ধাপঃ							
১	সম্পা মাহমুদ	হাটশহরীপুর	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া	খুলনা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
২	সানজিদা সুলতানা	মরজাল	রায়পুরা	নরসিংদী	ঢাকা		
৩	তাহেরা খাতুন	রংছাতি	কলমাকান্দা	নেত্রকোণা	ময়মনসিংহ		
পঞ্চম ধাপঃ							
১	শাহিদা মোশারফ	দুপ্তারা	আড়াইহাজার	নারায়ণগঞ্জ	ঢাকা	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত
২	মেহেদী হাচিনা পারভীন	রতনদিয়া	কালুখালী	রাজবাড়ী			
৩	সেলিনা জামান	চরআত্রা	নড়িয়া	শরিয়তপুর			
৪	নীলুফার ইয়াসমিন	নগর	বড়াইগ্রাম	নাটোর	রাজশাহী		
৫	মাজেদা খাতুন	জারিয়া	পূর্বধলা	নেত্রকোণা	ময়মনসিংহ		
৬	পারভীন হাসান প্রীতি	চৌহাট	ধামরাই	ঢাকা	ঢাকা	স্বতন্ত্র	
৭	মহসীনা হক	মোল্লারকান্দি	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ			
ষষ্ঠ ধাপঃ							
১	তাসলিমা আক্তার	নলুয়া	সাতকানিয়া	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	
২	মোছা: রোকসানা বেগম	দত্তেরবাজার	গফরগাঁও	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ		
৩	মোছা: জেসমিন নাহার রাণী	মেদুয়ারী	ভালুকা				
৪	শামছুন্নাহার	দেওরগাছা	চুনারুঘাট	হবিগঞ্জ	সিলেট		
৫	মোছা: সুলতানা আখতার	মমিনপুর	রংপুর সদর	রংপুর	রংপুর	জাতীয় পার্টি	

চেয়ারম্যান পদে অতীতে নির্বাচিত নারীদের তথ্যের তুলনা করলে করে দেখা যায় যে, এবারের নির্বাচনেই সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৭ সালে ২৩ জন, ২০০৩ সালে ২২ জন এবং ২০১১ সালে নির্বাচনে ২৩ জন নারী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমরা মনে করি ৪০০০জনের মধ্যে মাত্র ২৯জন (০.৭২%) জন নারীর নির্বাচিত হওয়া বিষয়টি ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার অঙ্গীকার এবং নারীর ক্ষমতায়নের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রাজনৈতিক দলসমূহকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

১০. আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিচারে এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন: এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন কেমন হলো, তা আমরা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ('সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস') ভিত্তিতে বিচার করে দেখতে পারি। যাতে বলা হয়েছে, ৫টি বিষয়ের নিরিখে বলা যায় নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে কি না। বিষয়গুলো হচ্ছে, ১.ভোটার তালিকা প্রস্তুতের প্রক্রিয়ায় যাঁরা ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন, তাঁরা ভোটার হতে পেরেছেন; ২. যাঁরা প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন; ৩. ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল; ৪ যাঁরা ভোট দিতে চেয়েছেন, তাঁরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন এবং ৫. ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। এই পাঁচটি মানদণ্ডের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই যদি 'হ্যাঁ বোধক' উত্তর আসে, তবেই আমরা বলতে পারি যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। কিন্তু এই নির্বাচনে আমরা তা বলতে পারছিনা; কেননা প্রতিটি মানদণ্ডের উত্তরই এখানে 'না বোধক'। উল্লেখ্য আমাদের দেশের ভোটার তালিকায় পুরুষ ও নারী ভোটারের অনুপাত প্রায় সমান হলেও ২০১৪ ও ২০১৫ সালের ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় নতুন ভোটারদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫৬:৪৪ এবং ৫৩:৪৭; যা বাস্তবসম্মত নয়।

১১. করণীয়: দলভিত্তিক স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও কার্যকর স্থানীয় সরকারের বিষয়টি এক করে ভাবলে আমাদের সামনে দুটি অবশ্য করণীয় রয়েছে। তা হচ্ছে, **এক.** স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ, **দুই.** ব্যাপক সংস্কারের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে সুস্থতা ফিরিয়ে আনা। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন একটি বলিষ্ট বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে আরও ক্ষমতা, দায়িত্ব ও সম্পদ দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রকৃত অর্থেই শক্তিশালী করা। এক্ষেত্রে জাতীয় বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নামে বরাদ্দ এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন; জনঅংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে জনবল বৃদ্ধি; জনপ্রতিনিধিদের ভাতা যৌক্তিকতার নিরিখে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করা; সংসদীয় রীতিতে প্রথমে সকলকে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে পরে তাঁদের ভেতর থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মেয়র, চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা; নারীদের জন্য ঘুর্ণায়মান পদ্ধতির আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংসদ সদস্যদের প্রভাবমুক্ত করা; জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো মামলায় অভিযোগ গঠনের সাথে সাথেই সদস্যপদ বাতিলের বিধান বাতিল করা ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনানুযায়ী পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এক্ষেত্রে ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন, নিয়মানুযায়ী কর নির্ধারণ ও নিয়মিত কর আদায়, স্থায়ী কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহকে সংশ্লিষ্ট সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়সমূহকে আইনানুযায়ী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে দলের সংস্কারের কথা আগে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, দলের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, সৎ-যোগ্য নেতাকর্মীদের গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ন করা ও দুর্বৃত্তদের বিতাড়িত করা, লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি বন্ধ করা, নির্দিষ্ট সময় পর পর সম্মেলন করা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতৃত্ব নির্বাচন করা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কমপক্ষে ৩ বছর ধরে দলের সঙ্গে যুক্ত আছেন এমন নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দলীয় রাজনীতিতে সুস্থতা তথা আদর্শের চর্চা ফিরিয়ে আনতে হবে।

রাজনৈতিক সংস্কারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন ও শক্তিশালী একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। এক্ষেত্রে সকল নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে যথাযথ নির্বাচনী আইন প্রণয়ন যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি সৎ, দক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান। সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে আইন প্রণয়ন এবং সেই আইন মোতাবেক পদ্ধতিগতভাবে কমিশনারদের নিয়োগ এখন সময়ের দাবি। উল্লেখ্য, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত আমাদের সংবিধানে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন করার কথা থাকলেও, সংবিধান প্রণয়নের ৪৪ বছর হয়ে গেলেও আমরা অদ্যাবধি সেই আইন প্রণয়ন করতে পারিনি। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতিগতভাবে আমাদের এই বিষয়টিতে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন, যাতে নতুন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষেই পরবর্তী মেয়াদের নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করা যায়। রাজনৈতিক সংস্কারের আর একটি বড় বিষয় হলো জনপ্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয়করণের প্রভাবমুক্ত করা। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে গণতান্ত্রিক চেতনাকে সমুন্নত রেখে আমাদের আচরণগত পরিবর্তন এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে বহুমত-বহুপথের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতকরণ।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, আশির দশকের একটি ধ্বংসস্তুপ থেকে তুলে এনে নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিক থেকে অব্যাহত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আমরা পুরোপুরি পরিশুদ্ধ করে ফেলেছিলাম। এবারে যে ধরনের নির্বাচন আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, তাতে জনমনে এই আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে যে, আমরা কি নির্বাচন ব্যবস্থাকে আবারও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? এই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন যদি 'মডেল' হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পায়, তবে সত্যি সত্যিই আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়বে। ভেঙ্গে পড়বে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও – যা কারো জন্যই কল্যাণ বয়ে আনবে না।

তাই কালবিলম্ব না করে জাতীয় স্বার্থে এই নির্বাচনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য একটি জাতীয় সংলাপের আয়োজন একান্ত জরুরি। সংলাপে সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক দল, সরকারের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ, নাগরিক সংগঠন, নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত সংলাপেই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের খুটি-নাটি বিভিন্ন দিক নিয়ে খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে হবে। কিভাবে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে পরিশুদ্ধ করা যায়? ভবিষ্যতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো দলভিত্তিক ভাবে হবে কি না? দলভিত্তিকভাবে হলে, কী ধরনের প্রস্তুতি আমাদের গ্রহণ করা উচিত? নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য আইনটি কেমন হওয়া উচিত? আইনে সার্চ কমিটি থাকবে কি না? সার্চ কমিটি হলে, সেখানে কারা কারা থাকতে পারে? ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে সংলাপে আলোচনা করে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্ধারণে জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে হবে। তাই কালবিলম্ব না করে জাতীয় স্বার্থে এই নির্বাচনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য একটি জাতীয় সংলাপেরআয়োজন একান্ত জরুরি।

আশাকরি সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে গণতন্ত্রের ভিতকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবো এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো। আশাকরি সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে গণতন্ত্রের ভিতকে সৃদৃঢ় করতে সক্ষম হবো।